সত্তরের দুটি উপন্যাস : ফিরে দেখা

বিশ্বজিৎ রায়

অনুষ্টুপ প্রকাশিত সত্তর দশক [প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৮০] নামক বাঙালির রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাদানুবাদের মূল্যায়নকামী বইটিতে এই দশকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বাংলা উপন্যাসের 'অসম্পূর্ণ' একটি তালিকা আছে। এই তালিকায় শঙ্কর বসুর নামটি খুঁজে পাওয়া যাবে জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক শঙ্করের নামের ঠিক তলায়। অন্য কোনও কারনে নয়, নামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা বলেই এই পর পর পাতন [সমাপতন নয়]। জনপ্রিয়তার বিচারে শঙ্করের সীমাবন্ধ, জন- অরণ্যও, এক যে ছিল, সম্প্রাট ও সুন্দরী শঙ্কর বসুর কমুনিস আর শৈশব থেকে বহুযোজন এগিয়ে। তাছাড়া সীমাবন্ধ ও জনঅরণ্য সত্যজিতের স্বর্ণস্পর্শধন্য। সীমাবন্ধ ছবি হয়েছিল ১৯৭১-এ, জন অরণ্য ১৯৭৫-এ। সত্যজিৎকৃত ইংরেজি নাম যথাক্রমে Company Limited ও The Middle Man. বাংলা নামের পরোক্ষতা ও ব্যঞ্জনা বাদ দিয়ে ইংরেজি নামে সত্যজিৎ সরাসরি বিষয় ও বিষয়ীকে প্রকাশ করতে চাইছেন। সত্তরের দশকের অর্থনৈতিক সংকট, ভদ্রলোক পরিবারের যুবাপুরুষদের কর্মপ্রচেষ্টা ও মূল্যবোধকে কীভাবে নির্ধারিত করতে পারে তারই চলচ্চিত্রভাষ্য নির্মাণের মাধ্যমে সত্তরের দশকের বাস্তবকে বুঝতে চাইছিলেন সত্যজিৎ।

'সীমাবন্ধ' শ্যামলেন্দুর কাহিনি— ফ্যান কোম্পানির উচ্চপদস্থ এই কর্মীটি তার অর্থনৈতিক উচ্চাশা পূর্ণ করার জন্য কীভাবে গলদওয়ালা ফ্যান রপ্তানীর সিদ্ধান্ত নেয়, সেই গলদের দায়িত্ব এড়াতে কীভাবে লক -আউটের রাজনীতিকে কাজে লাগায় তাই নিয়ে ছবি। জন-অরণ্য অর্ডার সাপ্লায়ারের গল্প। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্রটি নিরুপায়ভাবে চাকরি প্রত্যাশী। ১৯১৯ -এ ইন্টালেকচুয়াল প্রোলেটারিয়েট। সত্তরের দশকে সোমনাথদের মতো ইন্টালেকচুয়াল প্রোলেটারিয়েটেরা, সর্বহারার জন্য মহানবিপ্লবে কেউ কেউ যোগ দেয়, আর কেউ কেউ চাকরির পিছনে ধাওয়া করে। জনঅরণ্যের সোমনাথ শেষ পর্যন্ত বিশুদার (উৎপল দত্ত) বুদ্ধিতে অর্ডার সাপ্লায়ারের কাজে নেমে পড়ে— ঘটনাচক্রে গোয়েঙ্কার (শোভন লাহিড়ী) ভাগের জন্য মেয়ে সরবরাহ করতে হয়। এই মেয়েটি, করুণা (সুদেষ্ণা দাস) তার বন্ধুর বোন। উপার্জনের জন্য সোমনাথ মেয়েধরা দালাল আর করুণা যৌনকর্মী। (এই শব্দবন্ধ সত্তরের দশকে চালু ছিল না। মেয়েটি অবশ্য এই উপার্জন পদ্ধতিকে মেনে নিয়েছিল।) এই রূপান্তর মধ্যবিত্তের মূল্যবোধকে সংকটের মুখোমুখি ঠেলে দিচ্ছে। টাকা ও মূল্যবোধের সংকট, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের যা আলোড়িত ও আন্দোলিত করে তারই সাপেক্ষে সত্যজিৎ দেখছেন সত্তর দশককে। এই দেখায় ভদ্রলোক পরিবারের দুই পুরুষ চরিত্র শ্যামলেন্দু ও সোমনাথ অন্যতম অবলম্বন। একটু ঘুরিয়ে বলা চলে, বাংলা ভাষায় যে সাংস্কৃতিক পণ্য নির্মিত হয় ভদ্রলোকেরাই তো তার মুখ্য উপভোক্তা। কাজেই উত্তাল সেই দশকের সংকটকে তো ভদ্রলোকের আয়না দিয়ে দেখানোই নিরাপদ— সংখাগরিষ্ঠ, উপভোক্তার কাছে সহজে হাজির করা যায় শিল্পকর্মটিকে।

শঙ্কর বসু অবশ্য এই চেনাপথের শরিক নন। তবে কোন পথের? সত্তর দশকের শিল্প সাহিত্যকে নানা শিবিরে ভাগ করেছেন কেউ কেউ। এই শিবির বিভাজনের খেলায় কতগুলি নিক্তি গুরুত্বপূর্ণ। মহাশ্বেতা দেবীর মতো সমাজকর্মী ও 'পেশাদারি লেখক, বাজার চলতি পত্র-পত্রিকাই'। যাঁরা লেখার জায়গা তিনি সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলন বিরোধী লেখার তিনরকম চেহারার কথা খেয়াল করিয়ে দিয়েছিলেন। একদল এই রাজনৈতিক রক্তপাত সম্বন্ধে নীরব থেকে ব্যক্তিগত সুখের ও যৌনতার্সস্বতার কাহিনি লিখছেন। আরেকদল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিমোহিত— এ বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে সহানুভূতিহীন। এ ছাড়া তৃতীয়পক্ষও আছেন—'দায়িত্বহীন হিংসার সমর্থক' তাঁরা, 'যৌনতা - সদ্যপ্রীতি ও বিপ্লবের ককটেল' পরিবেশন করেছেন। প্রায় মহাশ্বেতার মতোই রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সত্তর দশকের রাজনৈতিক আন্দোলন বিরোধী রাজনৈতিক লেখকদের একহাত নিয়েছিলেন। রাকমৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মতে, এঁরা লেখেন সেইসব পাঠক পাঠিকাদের জন্য যাঁরা '৬৬-র পর ...সাবালক হয়েছে, বুর্জোয়া শিক্ষার প্রভাবে ন্যায্যতই পাপপূণ্য পরকালের ভয় কেটেছে, কিন্তু বিকল্প কোনও মূল্যবোধ তৈরি হয়নি।' এঁদের লেখায় ফিরে ফিরে আসে, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য উবাচ, মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী ঘরের ছাপোষা স্ত্রীপুরুষ, সুবিধেবাদী ভণ্ড কর্মচারী-ইউনিয়ন নেতা, ছোটো-বড়ো মাঝারি অফিসার, মদ্যপ প্রৌঢ়, ছেনাল তরুণী, মস্তান তরুণ, মস্তান বিপ্লবী ও ছাত্রনেতা, বেশ্যাসক্ত আভাঁগাদত কবিশিল্পী, ছাত্রি ধর্ষক অধ্যাপক। বিষয় নির্বাচনে ও উদ্দিষ্ট পাঠক পাঠিকারা কারা সে বিষয়ে সচেতনতা প্রদর্শনে যে বাহ্যত 'অরাজনৈতিক' কিন্তু নিহিতার্থে 'রাজনৈতিক' কৌশলের পরিপোষক এঁরা তারই উল্টোপক্ষে আছেন প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী সত্তর দশকের অন্য লেখকেরা। খুব সহজ সরল এই শিবির বিভাজন মেনে নিলে শঙ্কর বসু উল্টোদিকের লোক।

কমুনিস আর শৈশব এই উপন্যাস দুটি ভদ্রলোকের চেনা আয়নায় ভদ্রলোকের মুখ দেখার উপন্যাস নয়। কমুনিস উপন্যাসে মুখ্যত নকশাল যুবকদের, যুবতীও আছেন, কয়েকটি দিনরাত্রি যাপনের ক্রিয়াত্মক বিবরণ উঠে আসে। তাদের রাজনৈতিক অ্যাকশন, তর্ক-বিতর্ক, রাষ্ট্রের প্রহরায় নিযুক্ত পুলিশের হাতে তাদের মৃত্যু মিছিল এসব নিয়েই কমুনিস। আর শৈশবে পিতৃহারা একটি ছেলের শৈশব কথা। তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত দারিদ্র পীড়িত জনজীবন। উদ্বাস্তু কলোনির অভাব, অতীতের ছেঁড়াস্মৃতি—যে স্মৃতির মধ্যে স্বাধীনতার জন্য লড়াই আর দেশভাগের অসহায় যন্ত্রণা মিশে আছে, তাই শৈশবের অবলম্বন। শঙ্কর বসু যেন শৈশবকে খাড়া করেছেন আগে লেখা কমুনিসের পূর্বকথা হিসেবে। এই দুয়ের মধ্যে কার্যকারণ সূত্র স্পষ্ট নয়। শৈশবকে সোজাসাপটাভাবে কমুনিসের প্রিকোয়েল বলা যাবে না, তবু একটা যোগ আছে। পশ্চিমবঙ্গ নামক বিভক্ত স্বাধীন ভূখণ্ডে সত্তর দশকের যুবকেরা কেন রাজনৈতিকভাবে সোচ্চার হয়ে উঠল সে ইতিহাস বুঝতে গেলে স্বাধীনতার লড়াই, দেশভাগের কথা জানা আবশ্যিক। স্বাধীনতার জন্য দেশভাগ, যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার জনক বা জননী সত্তর দশক তো তাদেরই অসহায় অপত্য।

২. কমুনিস ছাড়পত্র এবং সম্মুখ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থরূপ লাভ করে ১৯৭৫-এ। ওই বছরেই সিনেমাহলের পর্দা কাঁপিয়েছে শোলে। শোলে নির্মাণে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের মানুষ মিলেমিশে একাকার। 'Its director was Sindhi, style is lyricist and one male lead was Panjabi. Other male leads were from Uttar Pradesh, Gujrat and North-West-Frontier respectively ...of the two female leads, one was a Tamil, the other a

Bengali domiciled in Madya prradesh. The music director was a Bengali-from Tripura.' নানা প্রদেশের ভারতীয়রা ১৯৭৫-এর এই ডাকাতিয়া কাহিনিতে মিলেমিশে কাজ করেছেন। ছবিতে 'বর্বর' ডাকাত সর্দার নিরপরাধ একগুচ্ছ মানুষকে হত্যা করে। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় এই সর্দারকে বন্দি করে রাখা অসম্ভব জেনে রাষ্ট্রব্যবস্থার বাইরে সংগ্রামী প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। শেষ সংগ্রামে ডাকাতসর্দার পর্যুদস্ত হল বটে তবে অন্যপক্ষের ক্ষতিও কিছু কম হল না। পরোক্ষ রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট দস্যু সর্দারের বিরুদ্ধে গ্রামের জনগণের হয়ে লড়ছিল যে দুজন তাদের একজনের বীরোচিত মৃত্যু ঘটে। রাষ্ট্রীয় পুলিশি ব্যবস্থার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা, ব্যবস্থাবিহীন নৈরাজ্য ও দস্যুপনা, রাগী যুবকদের অরাষ্ট্রীয় সীমার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ যুবকের সংগ্রাম প্রকল্প ভারতবর্ষের সব প্রদেশের মানুষের কাছেই বোধহয় একরকম গ্রাহ্যবিকল্প। তাই জনপ্রিয়তায় অভাব ঘটেনি। তবে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে বিকল্পব্যবস্থা নির্মাণের স্বপ্ন শোলের যুবকেরা দেখেনি। দুই যুবার একজন মারা গেছে, অন্যজন পরমানন্দে টাঙাওয়ালিকে বিয়ে করেছে। রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে, এই ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত দুর্নীতি ও সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে নায়কোচিত লড়াই করে যে রাগী যুবা তার জীবনযাত্রাও খুব 'আদর্শ' নয়, তবে সামাজিক রাষ্ট্রীয় গলদই যে এই যুবার আদর্শচ্যুতির কারণ তার একটা ইঙ্গিত ছবিতে থাকে। ওই লড়াকু যুবা শেষ পর্যন্ত অধিকতর দুর্নীতি নিরুপায়ত্বের ফল নয়— স্বজ্ঞানে এই দুর্নীতি পোষণ করা হয়েছে ও পরিপোষিত দুর্নীতি গ্রাস করছে অন্যান্য পরিসর। দুর্নীতি সাফ হল দেখেই দর্শক খুশি— নায়ক যে প্রহার প্রয়োগ করল তা আশাও করে না। জঞ্জির (১৯৭৩) দিওয়ার (১৯৭৫) ত্রিশূল (১৯৭৮) কালাপাথর (১৯৭৮) অমিতাভের সত্তর দশকের ছবিগুলির ক্ষেত্রে সংগ্রামী ক্রোধ এই ছকেই কোনও না কোনও ভাবে বিশ্লেষ্য। এমনকি সত্যজিতের কলকাতা ট্রিলজির একনম্বর প্রতিদ্বন্দ্বী সিদ্ধার্থের মধ্যেও তো অমিতাভকল্প ক্রোধ ফেটে পড়েছে একটি ইন্টারভিউ দৃশ্যে। বাবার মৃত্যুতে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিতে হয় যে সিদ্ধার্থকে, যাকে চাকরি খুঁজতে হয় অবিরত, সেই সিদ্ধার্থ একটি ব্যবস্থাপনা [আদতে যা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার নামে চাকরিবিহীন যুবকদের নিয়ে ছেলেখেলা] ইন্টারভিউয়ের টেবিল চেয়ার ভেঙে অমিতাভকল্প রাগ প্রকাশ করে। তবে সত্যজিৎ অন্যরকম 'ব্যবস্থা' ছবি করেন বলে শেষ পর্যন্ত দেখান সিদ্ধার্থ শহর কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র চাকরি নিয়ে চলে গেছে। (সত্যজিতের প্রতিদ্বন্দ্বী, সীমাবদ্ধ, জনঅরণ্য, তিনটি ছবিতেই কেন্দ্রীয় চরিত্রটির উপার্জন সংকট প্রকাশিত) বাস্তব আলাদা। সত্যজিৎ তাঁর কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলিকে ঠিক জয়লাভের পরিণতিতে সীমিত করতে চাইছেন না, কারণ তিনি জানেন ও মানেন জয়লাভের কাহিনি দেখাতে গেলে গুপী গাইন বাঘা বাইনের মতো বা হীরক রাজার দেশের মতো ছবি করতে হবে। গুপী গাইন ও বাঘা বাইন যুদ্ধবাজ প্রজাপীড়ক মন্ত্রীকে ভূতের রাজার বরের সাহায্যে পড়াভূত করল। পশ্চিমবঙ্গে তখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের ওঠাপড়া। ১৯৬৭ তে যুক্তফ্রন্ট সরকার যে ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন, তাতে 'সৎ, দুর্নীতিমুক্ত ও সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার' কথা বলা হয়েছিল। 'যুক্তফ্রন্ট সরকার খাদ্য, গৃহ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত জনগণের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির মেটানোর জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করেন' এ কথা ঘোষণা করা হয়েছিল— মুনাফাখোরি, মজুতদারি, কালাবাজারির বিরুদ্ধে এই সরকার। ঘোষণার বাস্তবায়ণ সম্ভব হয় নি, প্রায় সমকালে সত্যজিতের ছবি গুপী বাইন বাঘা বাইন অবশ্য গুপীবাঘার জয় দেখিয়েছিল। গানের কৌশলে এসেছিল সেই জয়। সত্তরের দশকের শেষে হীরক রাজার দেশে করলেন সত্যজিৎ। এ ছবি গুপী গাইন ও বাঘাবাইনের প্রথম ছবির থেকে অনেক বেশি সোচ্চারভাবে রাজনৈতিক। যে অসাম্য হীরক রাজ্যে আছে তা দূরীকরণের জন্য শুধু গান যথেষ্ট নয়, চাই যন্তর-মন্তর যন্ত্র। অসাম্যব্যবস্থা নিকেশ করার জন্য নতুনতর রাজনৈতিক বুলি ঢোকাতে হবে মগজে। ভূতের রাজা বর দিয়েছিল গুপী বাঘা চাইলেই ইচ্ছে মতো খাবার পাবে আর তাদের গান সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনবে। এ ছাড়াও ছিল যেখানে খুশি যেতে পারার বর। এই তিন বর কাজে লাগিয়ে হীরকরাজ্যের মগজধোলাইকারী ঘরটি দখল করে নিয়ে নতুন সাম্যব্যবস্থা সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক শ্লোগানে তারা ভরিয়ে দিল শোষণমন্ত্রের আধিকারিকদের মাথা। জয় এল। সত্যজিৎ গুপীবাঘার কাহিনিতে বাস্তবকে প্রেক্ষাপট হিসেবে ব্যবহার করেছেন বটে তবে, ফ্যান্টাসির পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন, চট করে চেনা যায় না। নায়ক গুপী বাঘা অবস্থার বদল ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত জিতেও যায়— কারণ রূপকথার সেটাই ধর্ম। তবে সত্তরের দশকে প্রধান ধারার বাঙালি সেগুলি বলিউডি রূপকথার আদলে থেকে আলাদা। অমিতাভের জয়লাভ তো একরকম রূপকথাই। সত্যজিৎ ভদ্রলোকদের সংকটকে তুলে ধরেছেন। ব্যবস্থাবদল জয় পরাজয় তাঁর কাছে গৌণ। যে উপন্যাসগুলি তিনি নির্বাচন করেছেন সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক নয়।

শোলে যখন পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাগৃহে দর্শক টানছে সত্তর দশকে সত্যজিতের ছবি মুক্তি পাচ্ছে তখন সেটা কোন পশ্চিমবঙ্গ? কয়েকবছর আগে থেকে শুরু করা যাক। খেয়াল করা যাক টুকরো-টাকরা হনন সংবাদ। এখন যেখানে কলেজ সার্ভিস কমিশনের অফিস সেই ভবানী দত্ত লেনে ১৯৭০ -এর ২৬ অক্টোবর পুলিশের গুলিতে তিনজন যুবক খুন। তাঁরা নাকি নকশালবাদী ছিলেন। সি পি আই-এর কেন্দ্রীয় মুখপত্র নিউ এজ ১৯৭১ -এর ৭ মার্চ সংখ্যায় বেলেঘাটায় পাঁচজন যুবক খুনের খবর জানাচ্ছে। এই ছাত্ররা নাকি পুলিশের ওপর বোমা ছুঁড়েছিল। তাই ১৫ ফেব্রুয়ারি ধরা পড়া যুবকদের রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হল। ১৯৭১,২০ ফেব্রুয়ারি। উত্তর কলকাতার ভিড়ে ভরা রাস্তায় ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্তকুমার বসু নৃশংসভাবে নিহত। ১৯৭৪। দ্রব্যমূল্য বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য অখিলবঙ্গ মহিলা সঙ্ঘের কয়েকজন কর্মী গ্রেপ্তার হল। নকশালপন্থী সন্দেহে তাদের নিয়ে যাওয়া হল লালবাজারের ভূগর্ভস্থ ছোট্ট ঘরে। এই যুবতীদের উলঙ্গ করে চিৎ করে টেবিলের ওপর রাখা হয়। তারপর ঘাড়ে স্তনে পেটে কোমল গুপ্তস্থানে জ্বলন্ত সিগারেটের ছেঁকা, অত্যাচারে কারো কারে গুহ্যদ্বার যোনির সঙ্গে নিশে যায়। ১৯৭৫, ৩ মে। হাওড়া জেলে রক্ষীদের গুলি ও ডান্ডার আঘাতে পাঁচজন নকশাপন্থী শেষ।

সত্তরের দশকের এই খুনখারাপির, মানুষের শরীরের উপর রাষ্ট্রীয় 'বিধি'র বা অরাষ্ট্রীয় 'সংগ্রামী'র আঘাত প্রত্যাঘাতের খবরে অভ্যস্ত জনতা 'শোলে' তে আর কী এমন নির্মমতা দেখেছে! উলঙ্গ যুবতী শরীরকে আন্ডারগ্রাউন্ড সেলে নির্যাতনের 'সামগ্রী' হিসেবে ব্যবহার করার তুলনায় শোলে ছবিতে ডাকু গব্বরের সামনে ঊষর ভূমির উপর হেমামালিনির নাচ নির্যাতন হিসেবে কিছুই না। আর শরীরী অত্যাচারের অবিকৃত বাস্তবতা তুলে ধরা তো এই ছবির উদ্দেশ্য নয়। প্রেম, রসিকতা, নির্বাচিত বর্বরতা [হাত কেটে দেওয়া, সামনে থেকে গুলি চালিয়ে খুন, খুন করে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে কিশোরের লাস পাঠানো ইত্যাদি], সংগ্রামীর মৃত্যু, টাঙাওয়ালির সঙ্গে জনগণের পক্ষে সংগ্রামীর বিবাহ এ সবের সামঞ্জস্যপূর্ণ ককটেল শোলে।

শোলের বছর জরুরি অবস্থারও বছর। ১৯৭৫-এই জুন মাস। ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন। জরুরি অবস্থা কেন? প্রিয়দর্শিনী আত্মপক্ষ সমর্থনেও যথেষ্ট পারদর্শিনী। এই রাষ্ট্রীয় দাওয়াই যে দেশ ও দশের হিতার্থে প্রদত্ত তেঁতকুটে ওষুধ তা জানাতে ভোলেন নি। 'However dear a child may be, if the doctor has prescribed bitter pills for him, they have to be administered for his cure.' আশিস নন্দী খেয়াল করিয়ে দেবেন দেশের ভদ্রলোক মধ্যবিত্তদের মধ্যে একাংশ জরুরি অবস্থার সমর্থক কারণ সার্বিক নানামুখী বিকেন্দ্রীভূত নৈরাজ্যের চাইতে কেন্দ্রীয় জরুরি অবস্থা ও ওই অবস্থাপ্রসূত দমননীতি তাঁদের কাছে সহনীয়।

সুতরাং সত্তরের দশকের বঙ্গজরা যেন নানাভাবে বাস্তবে যা আছে তা থেকে যা অধিকতর সহনীয় তাকেই কোনও না কোনোভাবে নানাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। সত্যজিৎ থেকে শুরু করে শোলের দক এমনকী জরুরী অবস্থার সমর্থক সবাই এই চাহিদাকে কোনও না কোনভাবেই গুরুত্ব দিচ্ছেন, তবে তাঁদের চাহিদার মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য আছে। সত্তরের গোড়াতে সত্যজিতের প্রতিদ্বন্দ্বী— সিদ্ধার্থ শেষ পর্যন্ত কলকাতা শহর থেকে চলে গেছে, নগর থেকে দূরে পাখির ডাকের সহনীয় বাস্তবে সে মুখ ঢেকেছে। একাত্তরে সীমাবদ্ধ পঁচাত্তরে জনঅরণ্য —অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সহনীয় এক জীবনযাত্রায় দু'ভাবে প্রবেশে সচেষ্ট দু'জন এবং ব্যর্থ। শোলের 'নির্বাচিত' বাস্তবের উপভোক্তাদের রাগ প্রশমিত হয় গব্বরনিধনে। পুরো ব্যবস্থা বদলাবে কি না সে প্রশ্ন না তুলে খানিকটা বদলের নিশ্চয়তায় ওই পাহাড়িয়া গ্রামদেশের মানুষই খুশি নয়, পর্দায় যাঁরা দেখেছেন তাঁরাও মনে মনে খুশি। জরুরি অবস্থার উৎপাদক প্রিয়দর্শিনী ও তাঁর প্রশাসনও তো রোগাক্রান্ত বাস্তবের চাইতে তেঁতো ওষুধ গেলানোর বাস্তবকে শ্রেয় বলে প্রচার করেন। সমর্থকদেরও মনে অন্তত দমননীতি কেন্দ্রীভূত—একদিক থেকে আক্রান্ত হতে হয়, নানা দিক থেকে আসা আঘাতের থেকে একটা ভালো ব্যবস্থা।

এক্ষেত্রে বাস্তব, যা অস্থির ও বাস্তব, যা প্রতিষেধক পরবর্তী তার কোনওটি 'আদর্শ' নয়। অথচ বাস্তব, যা 'আদশ' বলে বিবেচিত হতে পারে তার কল্পনা তো হতে পারে অন্যতম রাজনৈতিক কৃত্য। ওই বাস্তব কল্পনার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়ার রাজনৈতিকতার অংশীদার যারা তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, তা ব্যর্থ হলেও, তুলে ধরার প্রয়াস করতে পারেন কোনও পেশাদার লেখক। এই 'আদর্শ' গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবে না— অন্তত সত্তরদশকে ভারতীয় গণতন্ত্রের যা হাল তাতে গণতন্ত্রের আদর্শ সম্বন্ধে দ্বিধা ও বিরক্তি অনিবার্য— ধরে নিয়েই পরিবর্তনকামী বিপ্লব পন্থায় যুবকদের, যুবতীদের আত্মনিয়োগ। তার বাস্তবোচিত— যা ঘটমান—নির্ভরযোগ্য বিবরণই শঙ্কর বসুর উদ্দেশ্য। আত্মনিয়োগ 'সাফল্য' পেল কি না তার বিচার্য নয়, আত্মনিয়োগ ও আত্মনিয়োগ পরবর্তী ঘটনার বিবৃতিকার তিনি। এই বিবৃতির মধ্যে চরিত্রগুলির চিন্তন ও কর্মসামর্থ্য এবং দ্বিবিধ সামর্থ্যের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার বোঝাপড়া প্রকাশিত। রচনা কালের দিক দিয়ে কমুনিস পরবর্তী কিন্তু ঘটনাগত দিক দিয়ে কর্মকাহিনি পাওয়া যাবে না, তা শতছিন্ন দারিদ্র্য ও অসহায় পারিবারিকতার গল্প। এই দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ দেশভাগ। তবে দেশভাগ পরবর্তী দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে পারতেন যে পরিবার প্রধান, সেই লড়াকু পুরুষটি তো দেশভাগপূর্ব পরাধীনতা বিরোধী বিপ্লবে আত্মনিয়োগ করে হারিয়ে গেছেন। তাই দেশভাগ পরবর্তী গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে উদ্বাস্তু পরিবারটির বেঁচে থাকার লড়াই আরও কঠিন হয়। এই উদ্বাস্তু মানুষগুলিই তো সত্তরদশকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। গণতান্ত্রিক ক্ষমতার পরিবর্তনে দক্ষিণপন্থীদের বদলে বামপন্থীদের পথ সুগম করবেন। শৈশব উপন্যাসে এ রাজনৈতিকতা স্পষ্টও নয়। প্রত্যক্ষও নয় তবে অভ্যাসিত। ফলে শঙ্করবাবুকে ভদ্রলোকদের আয়নার বাইরে মুখ রেখে, পরিবর্তনকামী রাজনৈতিকতার কার্য কারণতন্ত্রের সূত্রে, স্বাধীনতা কালপর্ব থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত সময়ে, বঙ্গদেশের বিশেষ নিবন্ধবিত্ত, উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর পরিচয়বাহী বাস্তবোচিত উপন্যাস রচনার জন্য কলমপাতা করেন তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

৩. কমুনিস উপন্যাসে লেখকের জবানিতে জানিয়ে ছিলেন শঙ্কর বসু 'সত্তরের মানসিকতার একফোঁটাও যদি অবিকৃতভাবে উপস্থিত করে থাকতে পারি তাহলে শ্রম সফল হয়েছে মনে করব।' রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্কর বসু যে নামে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের নাগরিক, তাঁর জার্নাল সত্তর (২০০০) বইয়ের গোড়ায় প্রায় একই ভাষায় লিখেছিলেন, 'শহরের একটি অঞ্চল ও সময় কীভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছিল তার প্রতিটি রেখা, ভঙ্গি বেঁচে থাকার স্বপ্ন ও সাহস যদি এই বয়ানে অন্তত কিছুটা স্পষ্টতা অর্জন করে থাকে, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক।' আবিকৃতভাবে উপস্থিত করা আর স্পষ্টতা অর্জন করা এই দুই ভাবনা অসম্পর্কিত নয়। বাস্তবতার প্রতি বিশেষ দায়বোধ এবং মধ্যে ক্রিয়াশীল। সত্তরের দশকের আইনহারা নৈরাজ্যের নেতিবাচকতাকে, জরুরি অবস্থা কেন্দ্রীভূত দমনমূলকতার সাহায্য প্রতিরোধ করার রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের বাইরে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তকামী যুবকযুবতীদের স্বপ্ন ও সাহসের বাস্তবকে অবিকৃতভাবে তুলে ধরাই সত্তর দশকের শঙ্কর বসুর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য তাঁর সাহিত্য বোধকেও নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে।

প্রশ্ন হল কীভাবে তিনি বিবৃত করেছেন এই বাস্তবকে? কমুনিস ও শৈশব দুটি উপন্যাসেই শঙ্কর বসু সংলাপ ও বাচর রচনার ক্ষেত্রে চরিত্রগুলির বিশেষ সামাজিক ও শ্রেণীগত অবস্থানকে স্মরণে রাখছেন। কলকাতা নাগরিক ভদ্রলোকদের মুখের ভাষা যা আদতে মান্য চলিত ভাষা শঙ্কর বসু তা ব্যবহার করেন না। নগর কলকাতার মধ্যে আরো অনেক কলকাতা আছে, সেই অন্যরকম কলকাতা তার 'অপভাষা' সব শঙ্করবসুর উপন্যাসে উপস্থিত।

'কানায় কয় বয়ারাম শোনে/বার্‌তি কথায় হয়-হয় করে' এই লোকবাচনিক দ্বিপদীতে শুরু হয়েছিল শৈশব। এই উপভাষা নিস্নাত বিদ্বপতীর মধ্যে লোকসাহিত্যের চিরায়ত সম্পদ খোঁজার প্রয়াস 'বাতুলতা' হবে। উনিশ শতকে এবং বিশ শতকে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের অনুশীলনকারীরা যে চিরায়ত বঙ্গের কল্পনা করেছিলেন, তাঁরা লোকসাহিত্য সেই চিরায়ত বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত। দেশ কখন ভাঙাচোরা ভাবে স্বাধীন হল তখন সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের একমাত্রিক কল্পনা পরাভূত ও সমালোচনাযোগ্য উপাদান। দেশের কেন্দ্রীয়তায় অনেকেরই জায়গা হয়নি, জায়গা হওয়া উচিত ছিল। তাঁদের প্রান্তবর্তী ক্ষোভ তাঁরা তাঁদের 'অমান্য' ভাষাতেই প্রকাশ করেন— কোনও চিরায়ত উপলব্ধির ভাষা হিসেবে তাঁদের ভাষাকে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী নন। এই দূরত্ব— কেন্দ্রের সঙ্গে— অনিবার্য ও স্বাভাবিক। শৈশব উপন্যাসে স্থানীয় ভাষা বাহিত প্রবাদসম পঙ্‌ক্তিমালা এই

প্রান্তবাসী উদ্বাস্তুদের অভিমান, রাগ ও ক্ষোভের সূচক। শৈশব উপন্যাসে ইস্কুলের কানাইদা স্বাধীনতা দিবসের বোঁদে লোলুপ ছেলেটিকে যেভাবে মেরেছিলেন, তাতে সে রক্তের দাগ আর সর্দিলালায় মাখামাখি। কানাইমাস্টারের এই নিরুপায় রাগ এই উপন্যাসের তলায় তলায় চোরাস্রোতের মতো কাজ করে গেছে। আর সেই জন্যই যেন বিশেষ এক ভাষাভঙ্গি নির্মাণ করতে চান রাঘব। এই ভাষাভঙ্গি লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে-র মতো নিরাপত্তাকামী মধ্যবিত্তের প্রিয় প্রবাদকে নিজস্ব উচ্চারণে ভেঙচি কাটে— ল্যাখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোরা চড়ার মধ্যে যে সহজ সমানুপাতিক সম্পর্ক কল্পনা করা হয়, সেই সহজ সমানুপাত তো এই মানুষগুলির জন্য স্বাধীনরাষ্ট্র বিলিব্যবস্থা করেনি। তিনডা খুদের হাঁড়ির জন্য তিন মাগি 'আনায়াসে' রাঁড়ি হয়ে যেতে পারে যে ভাঙা বনেদে সেই ভাঙাবনেদের শৈশবকথার বাস্তবই রাঘবের প্রকাশের উপজীব্য। তবে হ্যাঁ, প্রধান ধারার হিন্দিছবির মতো এমনকী— জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাস ফেরতা সত্যজিতের ছবির মতো কোনো নান্দনিক প্রশমনপন্থার অনুসারী নন রাঘব।

যেন ভুলে না যাই নামে একটি ছোট্ট পুস্তিকা লিখেছিলেন শোভা ঘোষ। বরিশাল সমিতি থেকে প্রকাশিত এই বইটির প্রকাশকের নিবেদন অংশে জানানো হয়েছিল, 'পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলের বাংলাভাষার বিভিন্ন রূপ বর্ত্তমান। সেই সব ভাষাকে বাঙ্গালভাষা বলা হইয়া থাকে। বরিশাল, ঢাকা, মৈমনসিংহ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলে বাঙ্গাল-ভাষার বিভিন্ন রূপ ও প্রকাশ ভঙ্গি প্রচলিত আছে। সর্বসাধারণের ব্যবহৃত আটপৌরে এই বাঙ্গাল-ভাষা স্বাধীনতা লাভের পর এই ৩৫ বৎসর ধরিয়া নানা দেশীয় ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্রমশ রূপান্তরিত হইয়া পড়িতেছে।' শোভা ঘোষ চেষ্টা করেছিলেন এই ভাষার রূপান্তরকে আটকতে। ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট এই চারটি অঞ্চলের ভিন্ন ভাষায় চারটি আখ্যায়িকা লিখে ও তা এই নে ভুলে না যাই পুস্তিকায় সংকলিত করে ভাষাভেদ স্মরণ করিয়ে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। শুধু তাই নয়, 'তাঁহাদের সন্তানসন্ততি যাহাদের দেশবিভাগের পরে জন্ম হইয়াছে তাহাদের স্থানীয় ভাষায় কথাবার্তা বলিয়া থাকে এবং নিজেদের দেশের ভাষা জানে না বলিলেই হয়। 'এই দেশ না-দেখা সন্তানদের দেশের ভাষার কাছে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস শ্রীমতী শোভা ঘোষের এবং তা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের মডেলকেই অনুসরণ করে এরকমভাবে। রাঘব জানেন শৈশবের ছেলেটি কখন বড় হয়ে উঠবে কে আর তার মায়ের ভাষায় রাগ প্রকাশ করবে না। ভাঙাদেশ যে অব্যবস্থা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে যদি সে যুবা বয়সে লড়াই করতে চায় তাহলে তার রাগের ভাষা কলকাতার রাগী যুবকদের মুখের ভাষার সমগোত্রীয় হয়ে উঠবে। এটা বাস্তবতার যুক্তি। ফলে কমুনিস উপন্যাসের যুবকদের ক্রোধের ভাষা কলকাত্তাইয়া— এই বুকনির পেছনে কোনো যেন ভুলে না যাই গোছের আবেগ নেই। একটা দুটো নমুনা দিলেই টের পাওয়া; ১। 'শালা... । জানা জিম্মা পড়ে গেছে।' ২। তুমি তো জানো এসব ঘোড়ার ডিম - পোষায় না আমার। আর তক্কাতক্কি আমার আসেই না। মার্কসের কত নম্বর ভলুম, লেনিনের... ৩। কব্জি ছিঁটে হেঁসোর টানে জলজঙ্গল আর গোখরো সাপ নিকেশ করে জমিন বানাল। ৪। ভাবতে ভাবতে গোরা কোথায় কেন তলিয়ে যায়। আর সোনার মুকুট আচমকা চোখের সামনে টুনি বালব্ -এর মতো, বিলত সংকেতের মতো জ্বলতে থাকে, নিভতে থাকে।... মাথার দু'পাশে রগগুলো ফুলছিল। ফুলে ফুলে গুটলি পাকিয়ে যায়। ৫। গোরা ফুঁক মেরে মোমবাতি নিভিয়ে দিল।

'কমুনিস'-এর দ্রোহী যুবকদের এই ভাষা অতীতের কোনও দুর্বহ স্মৃতিকে ধারণ করে নেই, যেমন শৈশবের প্রবাদবাক্যকল্প দ্বিপদীগুলো স্মৃতিধারকের করেছে এক্ষেত্রে তেমন নয়। অতীতকে কেন ও কীভাবের কার্যকারণসূত্রে অন্বিত না করেই এই ছেলেগুলি ভবিষ্যৎপন্থী বদল চায়। অবশ্য বদল আসে না। কমুনিস তো আর গুপীবাঘার গল্পের নয় কে ভূতের রাজার বরে সবসমস্যার নিকেশ হবে, রাজা খান খান হবেন। এদের জন্য থেকে যায় গোরার গর্ভধারিণী জননীর পূর্ববঙ্গীয় বিলাপ 'কপালে এইয়াও ছিল...' গোরা অবশ্য তার বন্ধুদের মতোই এই পূর্ব-বঙ্গীয় ভাষা ও সেই সাংস্কৃতির অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন। বর্তমান অবস্থার বদলই তার বিবেচনাধীন বাস্তব। এই বাস্তব শেষ পর্যন্ত তাদের পরাভূত করে। 'পার্টিকে জিন্দা রাখার নিবিড় বিশ্বাস হাড়মাসে আগলে রেখে পাঁচজনের দল ঝাপটে পড়ল বেলেঘাটার পোড়া মাটিতে। তবু বেলেঘাটার মুখে বোল নেই।'

কমুনিস ও শৈশব দুই উপন্যাসেই এই যে প্রশমনহীন ক্রোধ ও পরাভবকে বাস্তবোচিত ভাবে প্রকাশ করলেন রাঘব তা নিয়ে তাঁর কিছু আত্মসমালোচনাও ছিল। বিপ্লবের উদ্দেশ্যগত মহত্ত্বকে তিনি অস্বীকার যেমন করেন নি তেমনই এর পদ্ধতিগত পরাভবকেও মেনে নিয়েছেন। এটা মেনে নিয়েছেন, কারণ বাস্তবকেই তিনি কখনওই বেকবুল করেন না। উপন্যাস দুটির পুনর্মুদ্রণকলে আত্মসমালেচনার ভঙ্গিতে নিবেদন করেন, 'প্রথম দিকে রচনাগুলি পিছনে রাজনীতির প্রত্যাদেশ অনেকটা কাজ করেছে। পেশাদার লেখকের যত্ন। সংশয় ও প্রশ্নের ঘাটতি ছিল।' এই সযত্নে সংশয় ও প্রশ্ন থেকেই রাঘবের দ্বিতীয় ইনিংসের সূত্রপাত। স্পন্দন পত্রিকার প্রয়াত সম্পাদক সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক কারণেই শঙ্কর বসু এই ছদ্মনামটি স্থির করেছিলেন, সেই ছদ্মনামের খোলস ছেড়ে স্বনামে আত্মপ্রকাশ করলেন লেখক।

সংশয় ও প্রশ্ন বলতে কী বোঝাতে চাইছেন রাঘব? সত্তরের দশকের উপন্যাসে যে বাস্তবতার প্রতি দায়বদ্ধতা ছিল তাঁর সেই বাস্তবতার প্রতি দায়বদ্ধতা বজায় থাকছে তাঁর শুধু বাস্তবতা আর সেই বাস্তবতাকে প্রকাশ করার শৈল্পিকতা দু'য়ের মধ্যে যে এক সংঘাতময় লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে সর্বদা রাঘব তা টের পাচ্ছেন। টের পাচ্ছেন তাঁর ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক বন্ধুবর্গের (পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র, দীপেশ চক্রবর্তী) মতোই। এই যে লুকোচুরি, অর্থাৎ কোন বয়ানে, কীভাবে, কতটা, বাস্তবকে ধরা সম্ভব তাই বামন অবতার, সটীক জাদুনগর, শোকবার্তার কয়েকটি লাইন, চোর চল্লিশা, আশমনি কথার মতো আখ্যান (উপন্যাস ও গল্প) সমূহের কেন্দ্রীয় প্রয়াস। কমুনিস উপন্যাসে একটি বাদানুবদের বিবরণ ছিল। সেই বাদানুবাদ থামিয়ে দিয়েছিল নিহত সোনার 'প্রিয়া' মিনু।

'মিনু কান্নার মতো গলায় কথার অজস্র ফুল ফুটতে লাগাল : তোমরা মানুষগুলোকে রাস্তা দেখাবে... বোবা মানুষগুলোর মুখে বোল ফোটাবে...এককাট্টা লড়াইর স্বপ্ন, মানুষের মতো বাঁচার স্বপ্ন। পাগল হয়ে তারা বিষের ঝাড় উপড়ে ফেলবে। তছনছ করে দেবে জল্লাদের দেনা। ঝান্ডা নেড়ে বলবে : এদেশ আমার, এখানে খুনির জন্য এক ইঞ্চি জায়গা নেই...তোমরাই যদি খেয়োখেয়ি কর...' এই আবেগ দীপ্ত বক্তব্য বাদানুবাদেকে থামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আপাতভাবে, নাহলে কেনই বা আশমানি কথায় রাঘব আনবেন মর্জিনাকে! লা মার্টের মর্জিনা। বেলেঘাটায়, চড়ক ডাঙায়, তখন ছুটছে থ্রি নট থ্রি বুলেট, সকেট বোমা, মলোটভ ও

ককটেল। এই মর্জিনা পরে অর্থনীতির ছাত্রী। আন অর্গানাইজড সেকটর নিয়ে গবেষণা করে। একুশ বছর বয়সের মধ্যেই সে গুটিকয় ছেলের মাথা খেয়েছে, তাদের বিছানা গরম করেছে। নিজের জরুরি কাজ ফেলে কারখানায় গেটমিটিং করেছে। আন্ত্রিকের রুগীকে আই ডি-তে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেছে। যৌনবিশ্বস্ততার সে ধারা ধারত না। কারণ, 'সেক্সুয়াল রিলেশন ইজ অ্যান এক্সটেনশন অব অ্যাফেকশন।' এই মর্জিনার মাছে বাস্তব নানাখানা— মিনুর মতো আদর্শের একখানা বহরে তা ধরা পড়ে না। এই নানাখানা বাস্তবকে ধরার জন্য রাঘব তাই নানা জনের কথায় বয়ান সাজান, ক্রমিকতা ভেঙে দেন। ফটো, মানচিত্র, আত্মকথা, বকোয়াজিগুল, হিস্টরিক্যাল ফ্যাক্ট মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় লেখায় পাতায়। ঔপনিবেশিক যুক্তিবাদ বাস্তববাদী উপন্যাসের বয়ান সাজানোর জন্য যে কার্যকারণবাদী পরিচ্ছন্নতার পক্ষপাতী চোরচল্লিশের মতো লেখায় তা ভেঙেচুরে খান খান। এ লেখায় 'কারও কোনও ফিক্স রোল নেই।' এই যে কারও কোনও ফিক্স রোল না থাকা এটা সত্তর দশকের 'কমুনিস' - এর 'বিপ্লবী' যুবক-যুবতীরা ভাবতে পারত না। বরং মিনু তো নির্দিষ্ট কাজ-এর কথাই বলছে। লা মার্ট-এর মর্জিনা, অর্থনীতি পড়া মর্জিনা আনঅর্গানাইজড সেক্টর নিয়ে কেমন করে তেমনই তার জীবনযাপনও কোনও কেন্দ্রীয় নীতির, যা একমাত্রিক ধ্রুবকল্প, চারপাশে ঘুরপাক খায় না—এটা তার ভবিতব্য। শৈশবে হারিয়ে যাওয়া জাতীয়তাবাদীপিতা বা সত্তর দশকের বিপ্লবখোর নকশাস—এরা মর্জির অতীত। তাদের সঙ্গে মর্জির পরম্পরাগত যোগ আছে এবং নেই। মধ্যবিত্তের নিশ্চিন্ত পারিবারিকতা মর্জির অতিক্রম করে এই পূর্বজদের মতো, কিন্তু এই পর্যন্ত। তারপর একরৈখিক কোনও লক্ষ্যে— দেশের স্বাধীনতা, সর্বহারার মহান বিপ্লব জাতীয় লক্ষ্য— কিন্তু যে অগ্রসর হয় না। এই গায়েব হয়ে যাওয়া মেয়েটি নানাখানা অভিজ্ঞতার, যা তার ব্যক্তিগতভাবে করতে ইচ্ছে করে, নিজেকে মিশিয়ে দেয়। এই যে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রশ্নে কোনও সামূহিকতার আদর্শ নির্দেশ না মানা, এবং না মানা থেকে সঞ্জাত নানা প্রশ্ন যাপন ও অভিজ্ঞতাকে নানা বয়ানে সাজানো, এটাই রাঘবের সত্তর দশকের পরবর্তী প্রয়াস। এই প্রয়াসও তীব্রভাবে রাজনৈতিক, তবে পূর্ববর্তী সত্তরদশকীয় রাজনৈতিক প্রত্যাদেশের মতো এটা ওপর থেকে নেমে আসে না— নিজের মধ্যে থেকে গড়ে ওঠে। এই নানা স্বর ও নানা অভিজ্ঞতায় ডুব আসলে প্রতি মুহূর্তে প্রতিষ্ঠানকে ও প্রাতিষ্ঠানিক উপাধিসমূহকে অস্বীকার করার জন্য জরুরি। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় শাসনকর্ত ও শাসনকারী প্রতিষ্ঠান, সত্তরদশকে বুর্জোয়া শাসনতন্ত্র বিপ্লবীদের চাঁদমারি— কারণ মনে করেছেন তাঁর ক্ষমতা শুধু এখানেই কেন্দ্রীভূত। ক্রমশ দেখা গেল, ক্ষমতার সর্বগ্রাহী অবয়ব নানারূপে, নানা স্থানে বিদ্যমান। এমনকী যাকে মন হয় না আপাতভাবে ক্ষমতার অধীশ্বর সেও কোনও মুহূর্তে ক্ষমতারই উপাদান হিসেবে ক্রিয়াশীল হতে পারে। তাই কোনও একটা সদর দফতরে তোপ দাগলেই মহান বিপ্লব সম্পন্ন হবে এই প্রতিনিয়ত হড়াইয়ে ধ্রুপদী ট্র্যাজেডির স্বাদ ও শহীদের সম্মান প্রাপ্তির আশা নেই। স্বাধীনতার জন্য শহীদ, সর্বহারার মহান বিপ্লবের জন্য শহীদ হওয়া এ নয়। যেমন চোরচল্লিশার জেলবন্দি সেই ডাক্তার— যে জয়েন্টের প্রশ্ন ফাঁসের জালে জেনে না জেনে ফেঁসে গেল— সে কবুল করে। 'জেল তার উপাধিগুলো— প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়— খুলে নিয়েছে। এও তো উপাধিবিহীন মানুষের, প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতিপক্ষে, সমালোচকের বয়ান। হতে পারে তাঁর 'বড় আদর্শ' নেই কিন্তু সেও তো প্রাতিষ্ঠানিকতা বিরোধী বিপ্লবে এরকমভাবে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। এই লড়াইও এরকম ভাবে রাজনৈতিকতাকে জারি রাখে। ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠান যেমন 'নৈতিকতা' বজায় রাখে না তেমনই এই লড়াই সব সময় কোনও বৃহৎ নৈতিকতা প্রসূত নয়, কোনও নিশ্চিত 'ভবিষ্যৎ' কল্পনাও এর মধ্যে অঙ্গীভূত নয়।

এই যে বাস্তবের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা এবং নিশ্চিত ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সামনে না রেখে নানা পাকেচক্রে প্রতিষ্ঠান ও ক্ষমতাবিরোধী লড়াইয়ে সামিল হওয়া তা বৃহৎ আদর্শনিষ্ঠ নিশ্চয়তাকে সামনে রেখে জয়-পরাজয়ের পরিণতি লাভ করে না বলেই ট্রাজেডি কিম্বা মহাকাব্যের ধারে কাছে যা না, যেতে চায় না। শুধু থাকে অন্তর্ঘাতী কৌতুক। এই এই কৌতুকের জন্য নানা চোরাপথ খোলা হয়— 'মহৎ সাহিত্য রচনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা গোপনে বয়ে বেড়ানোর মতো কোনও যোগ্যতা বা বোকামি আমার নেই। সুতরাং ওই রাজকীয় পথ আমার জন্য নয়। আমরা গলিখুঁজি, মায় কানাগলিতেও ঢুকব। সুলিখিত, সুচারু বিবরণ এই বইয়ের কোথাও পাবেন না।' [চোরচল্লিশা] এই বয়ানে 'সত্য-মিথ্যে, কার্যকারণ টোটালি ডিফারেন্ট/অলগা।'

এই কৌতুক সম্বন্ধে স্থিতিশীল কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানিকতার স্বাভাবিক সন্দেহ অনিবার্য। তাই কেউ বলতেই পারেন, শঙ্কর বসু রাজনৈতিকভাবে 'সৎ', তারই 'স্পষ্ট' রূপায়ণ ঘটাতে চেয়েছিলেন উপন্যাসে। রাঘব সেই 'সৎ' 'স্পষ্ট' -কে ব্যর্থ হতে দেখেই কৌতুকের অস্পষ্টতায় মুখ লুকোলেন। অভিযোগটির জবাব একটু ঘুরপথে দেওয়া যায়। চোরচল্লিশার 'ক্রিমিনাল'রা মুম্বাই ফিল্মি ডায়লগ হামেশাই কোট করত। 'বেইমানি ধান্ধায় ইমানদারিই সব চেয়ে বড় পুঁজি।' এটা সম্প্রসারিত অর্থে রাঘবের দুই পর্বের লেখার যোগসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা চলে। সত্তরের দশকের সামূহিক রাজনৈতিক প্রত্যাদেশ রাঘব প্রশ্নশীল বলেই মান্য করতে পারেন না—তা তো 'বেইমানি'। তবে রাঘব 'ইমানদার'। ক্ষমতার রূপ ও স্বরূপ বুঝে লড়াই করা পদ্ধতি বদলেছেন তিনি, লড়াইটা ছাড়েন নি। পদ্ধতি বদল তো ইমানদাররাই করেন— লড়াই হেরে যাওয়ার জন্য নয়, জারি রাখার জন্য।